# সুহাসিনী মাসিমা

(গল্পগ্রন্থ – বিধু মাস্টার)

সুহাসিনী মাসিমাকে আমি দেখিনি। কিন্তু খুব ছোট বয়সে যখনই মামারবাড়ি যেতুম, তখন সকলের মুখে মুখে থাকত সুহাসিনী মাসিমার নাম।

—সুহাস কি চমৎকার বোনে ! এই বয়েসে কি সুন্দর বুনুনির হাত !

—সুহাসিনী বললে, এসো দিদি বোসো। বেশ মেয়ে সুহাসিনী।

—সেবার সুহাসিনীকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালুম পূর্ণিমার দিন।

—সুহাসিনী ওসব অনেয্য দেখতে পারে না, তাই জন্যে তো মায়ের সঙ্গে বনে না।

সুহাসিনী গ্রামের সকলের যেন চোখের মণি। সুহাসিনী মাসিমা সম্বন্ধে কথা বলবার সময় সবারই অর্থাৎ আমার বুড়ি দিদিমার, গনু দিদিমার, মাসিমাদের, মায়ের, মামাদের গলার সুর বদলে যে, চোখে কি রকম একটা আলাদা ভাব দেখা যেত ! আর একটা কথা, রূপের কথা উঠলে সকলেই বলত আগে সুহাসিনী মাসিমার কথা, অমন রূপ কারো হয় না, কেউ কখনো দেখেনি।

শুনে শুনে আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হল যে, সুহাসিনী মাসিমাকে একবার দেখব। দেখতেই হবে।

দিদিমাকে একদিন বললুম, সুহাসিনী মাসিমা এখানে কোথায় থাকেন ?

—কেন রে ?

—আমি একদিন দেখতে যাব।

—সে তোর ওই কানাই মামার বোন ওপাড়ার। মুখুজ্যেদের দোতলা বাড়ি পুকুরধারে দেখিসনি ?তা সুহাস তো এখন এখানে নেই। শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে।

—বিয়ে হয়ে গিয়েছে বুঝি ?

—তা হবে না ?উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস হল, বিয়ে কোন্ কালে হয়েছে !

সুহাসিনী মাসিমার বিয়ে হওয়ার কথাটা যেন খুব ভালো লাগল না। কেন ভালো লাগল না তা কি করে বলব ?আমার বয়স ন বছর আর সুহাসিনী মাসিমার বয়স উনিশ-কুড়ি; বিয়ে হলেই বা আমার কি, না হলেই বা আমার কি !

মামারবাড়িতে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটিতে যাই, কিন্তু কোনো বার সুহাসিনী মাসিমারসঙ্গে আমার দেখা হয়নি। হয় তিনি বৈশাখের মাঝামাঝি চলে গিয়েছেন, নয়তো তিনি আসবেন শ্রাবণ মাসে শ্বশুরবাড়ি থেকে।

—ফাল্গুন মাসে এসেছিল সুহাস, বোশেখ মাসে চলে গেল। আজকাল থাকে ভালো জায়গায়। যেমন রং তেমনিই রূপ, যেন একেবারে ফেটে পড়ছে।

অন্য লোকের প্রশ্নের উত্তরে দিদিমা কিংবা আমার মাসিমারা এ ধরনের কথা বলতেন, শুনতে পেতাম। আমি কোনো প্রশ্ন এ সম্বন্ধে বড় একটা করতুম না, অথচ ইচ্ছে হত সুহাস মাসিমার সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানবার, আরো অনেক কথা শোনবার। কিন্তু কেমন যেন লজ্জায় গলায় কথা আটকে যেত, জিগ্যেস করতে পারতুম না।

—না, তা কি করে থাকবে, সুহাসিনী না হলে শ্বশুরবাড়ির একদিন চলে না—কাজেই চলে যেতেই হল, নইলে জষ্টি মাসে আম কাঁটাল খেয়ে যাবার তো ইচ্ছে ছিল। শাশুড়ি বলে—বউমা এখানে না থাকলে যেন হাত-পা আসে না—বউমার মুখ সকালে উঠে না দেখলে কাজে মন বসাতে পারি নে।—তাই ছেলে পাঠিয়ে নিয়ে গেল।

—একদিন কি হল জানো, দুপুরবেলা সুহাসের ফিট হয়েছে শুনে তো ছুটে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সামনে সানের রোয়াকে সুহাস অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে—আর তার মাথায় জল ঢালা হচ্ছে। মাথায় একরাশ কালো

কুচকুচে ভিজে চুল, দেহ এলিয়ে পড়ে আছে। অমন রূপ কখনো দেখিনি মানুষের কি রূপ ফুটেছে সুহাসের—সত্যি—

সুহাস মাসিমার রূপের ও গুণের প্রশংসায় এই গ্রামের সবাই পঞ্চমুখ। তারা জীবনে যেন এমন মেয়ে আর দেখেনি। ওদের মুখে মুখে সুহাসিনী মাসিমাও আমার মনে অত্যন্ত বেড়েই চললেন—কল্পনায়, চোখের দেখায় নয়।

অল্প বয়সে যখন মনের আকাশ একেবারে শূন্য, তখন লোকের মুখে শুনে শুনে ধীরে ধীরে একটি আদর্শ নারীমূর্তি আমার মনে গড়ে উঠেছিল—বহুকাল পর্যন্ত এই মানসী নারীপ্রতিমার কষ্টিপাথরে বাস্তবজীবনে দৃষ্ট সমস্ত নারীর রূপ ও গুণ যাচাই করে নিতাম, অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বোধ হয়। সে মানসী প্রতিমা ও আদর্শ নারী ছিলেন সুহাসিনী মাসিমা—যাঁকে কখনো চোখে দেখলুম না।

তখন কলেজে পড়ি। কি একটা ছুটিতে মামারবাড়ি গিয়েছি। তখন অনেকটা গম্ভীর হয়ে পড়েছি আগেকার চেয়ে এবং রান্নাঘরের কোণে বসে দিদিমা ও মাসিমাদের মুখে মেয়েলি গল্প শোনার চেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে মেজ দাদু ও মামাদের সঙ্গে জার্মান যুদ্ধের আলোচনা ও সে সম্বন্ধে নিজের সদ্য অধীত লজ-এর মডার্ন ইউরোপের ঐতিহাসিক জ্ঞান সগর্বে প্রদর্শন করবার ঝোঁক তখন অনেক বেশি। সকাল বেলা, আমি সমবেত দু-পাঁচজন লোকের সামনে বিসমার্কের রাজনীতি ও জীবনী (লজ-এর 'মডার্ন ইউরোপ' অনুযায়ী) সোৎসাহে বর্ণনা করছি, এমন সময়ে ওপাড়ার কানাই মামা (সুহাসিনী মাসিমার ছোট ভাই) এসে সেখানে দাঁড়াল।

মেজ দাদু জিজ্ঞেস করলেন—কি কানাই, কবে এলে কলকাতা থেকে ?

কানাই বললে—আজই এলুম কাকাবাবু। দিদি আজ ওবেলার ট্রেনে আসবে কিনা। দাদাবাবু পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে আসবেন, তাই আমি সকালের গাড়িতে চলে এলুম স্টেশনে গাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করতে।

শুনে মনে কেমন একটা আনন্দ ও উত্তেজনা অনুভব করলুম। সুহাসিনী মাসিমা আসবেন আজই, দেখব—এতকাল পরে সুহাসিনী মাসিমার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা হবে। আমার মনের সেই মানসী প্রতিমা সুহাসিনী মাসিমা ! তার পর আবার নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম নিজের মনের ভাবে। আসেন আসুন, না আসেন না আসুন—আমার কি তাতে ?

অথচ সন্ধ্যাবেলার দিকে কাঁটালতলাটায় পায়চারি করছিলুম, বোধ হয় কিছু উৎসুক ভাবেই। এই পথ দিয়েই সুহাসিনী মাসিমার গরুর গাড়ি স্টেশন থেকে আসবে। এই একমাত্র পথ।

সন্ধ্যার কিছু আগে গরুর গাড়ি স্টেশন থেকে ফিরে এল—কানাই মামার ছোট ভাই বীরু তাতে বসে।

জিজ্ঞেস করলুম—কোথায় গিয়েছিলি রে বীরু ?গাড়ি গিয়েছিল কোথায় ?

বীরু বললে—স্টেশনে। বড় দিদির আসবার কথা ছিল, এল না।

বললুম—রাত্রের ট্রেনে আসতে পারেন তো—

—না, তা আসবেন না ! অন্ধকার রাত, মেঠো পথ দিয়ে আসা—রাত্রের গাড়িতে কখনো আসবে না। কথাই আছে।

গাড়ি চলে গেল।

জীবনের গত দশ বছরের মধ্যে—তখন আমার বয়স ছিল নয়, এখন উনিশ—এই প্রথমবার সুহাসিনী মাসিকে দেখবার সুযোগ ঘটবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু উপক্রম হয়েই থেমে গেল, ঘটল না।

সেদিন কেন, তার পর প্রায় এক মাস সেখানে ছিলাম—সুহাসিনী মাসিমা তার মধ্যেও আসেননি।

কলেজ থেকে বার হয়ে ক্রমে চাকরিতে ঢুকে পড়লুম। বয়স হয়েছে চব্বিশ, যোল বছর কেটে গিয়েছে বাল্যের সেই মামারবাড়ির দিনগুলি থেকে। দিদিমা বেঁচে নেই, মামারবাড়ি যাওয়া আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে, সুহাসিনী মাসিমার কথা শুনতে পাই কেবল আমার আপন মাসিমাদের মুখে। তাও তত বেশি করে নয় বা তত ঘন ঘন নয়, বাল্যকালে যেমন দিদিমার মুখ থেকে শুনতুম।

কিন্তু তা বলে সুহাসিনী মাসিমা কি আমার মনে ছোট হয়ে গিয়েছিলেন ?

আশ্চর্যের বিষয়, তা মোটেই নয়।

বাল্যের সে মানসী প্রতিমা যেমন তেমনই ছিল, তার রূপের কোথাও একটুকু ম্লান হয়নি। বন্ধুবান্ধবের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে কত নববধূকে সেই মানসী প্রতিমার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে গিয়ে তাদের প্রতি অবিচার করেছি।

বয়স যখন ত্রিশ-বত্রিশ, তখন কলকাতায় এসে থাকতে হল কার্য উপলক্ষে। একদিন আমার মামার মুখে কথায় কথায় শুনলাম—সুহাসিনী মাসিমার স্বামী এখন বড় এঞ্জিনীয়ার, অনেক টাকা রোজগার করেন, বাগবাজারে নবীন বোসের লেনে সম্প্রতি বাসা করে আছেন। এমন কি মামা বললেন—যাবি একদিন ?সুহাস দিদির সঙ্গে আমারও অনেকদিন দেখা হয়নি। তুই কখনো দেখেছিস কি ?চল কাল যাওয়া যাক, ঠিকানাটা আমার ডায়েরিতে লেখা আছে।

পরদিন আমার কি একটা গুরুতর কাজ ছিল, তাতেই যাওয়া হল না। মামাও আর সে সম্বন্ধে কোনো কথা উত্থাপন করলেন না। আমি ইচ্ছে করলে একাই যেতে পারতাম—মামা ঠিকানাটা আমায় বলেছিলেন তার পর, কিন্তু তারা আমায় কেউ চেনে না, এ অবস্থায় যেচে সেখানে যেতে বাধত।

আরো বছর দুই-তিন কেটে গেল। আমার বয়স চৌত্রিশ। সংসারী মানুষ, ছেলেপুলে হয়ে পড়েছে অনেকগুলি। পশ্চিমের কর্মস্থান থেকে দেশে ঘন ঘন আসা ঘটে না। এ সময় একবার মামারবাড়ির গ্রামের কানাই মামার সঙ্গে জামালপুর স্টেশনে দেখা। কানাই আমার বাল্যবন্ধু এবং সুহাসিনী মাসিমার ছোট ভাই।

—কি হে, কানাই মামা যে ! এখানে কোথায় ?

—আরে শচীন যে ! তুমি কোথায় ?আমি এখানে আছি বছরখানেক, ওয়ার্কশপে কাজ করি।

—বেশ, বেশ। বাসা করে মেয়েছেলে নিয়ে আছ ?

—না, দিদি মুঙ্গেরে রয়েছে কিনা, জামাইবাবুর শরীর খারাপ, চেঞ্জে এসেছে। সেখান থেকেই যাতায়াত করি। এসো না একদিন। বেলুন বাজারে, গঙ্গার কাছেই। কবে আসবে ?

আমি থাকি সাহেবগঞ্জে। সর্বদা মুঙ্গেরের দিকে যাওয়া ঘটে না—তবু কানাই-এর কাছে কথা দিলাম একদিন সুহাসিনী মাসিমার বাসায় যাব মুঙ্গেরে।...সেটা কর্তব্যও তো বটে, দেশের লোক অসুস্থ হয়ে রয়েছেন দূর দেশে—আমরা যখন এদেশ-প্রবাসী—যাওয়া বা দেখাশুনো করা তো উচিতই।

সাহেবগঞ্জে ফিরে এসে স্ত্রীকে কথাটা বলতে সে-ও খুব উৎসাহ দেখালে।

বললে—চল না, মাসিমার সঙ্গে দেখা করে সীতাকুণ্ডে স্নান করে আসা যাবে। কখনো মুঙ্গেরে যাইনি—ভালোই হল, চল এই মকরসংক্রান্তির ছুটিতে—

একথা ঠিকই যে, এই দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর পরে সুহাসিনী মাসিমাকে দেখবার সে বাল্য ও প্রথম-যৌবন-দিনের আগ্রহ ছিল না—তবুও কৌতূহলে এবং মনের পুরনো অভ্যেসের বশে একদিন মুঙ্গেরে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করবার সঙ্কল্প করলুম। কিন্তু পুনরায় বাধা পড়ল। পৌষ মাসের শেষের দিকে সাহেবগঞ্জে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হল—আমি ছুটি নিয়ে সপরিবারে দেখে পালালুম। দিন উনিশ-কুড়ি পরে যখন ফিরলুম তখন মকরসংক্রান্তি পার হয়ে গিয়েছে, মুঙ্গেরে যাওয়ার কথাও চাপা পড়ে গিয়েছে।

এর মাস-চার পরে আবার কানাই-এর সঙ্গে দেখা জামালপুরে।

বললে—ওহে, তোমরা কই গেলে না ?তোমাকে খবর দেব ভেবেছিলুম—কি বিপদ গেল যে ! জামাইবাবু মারা গেলেন ও মাসের সতেরোই।

সুহাসিনী মাসিমা বিধবা !

বললুম—ওঁরা এখনো কি—

—না না। দেওর এসে নিয়ে গেল শ্বশুরবাড়ি। মস্ত ডাক্তার দেওর—অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন, গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে। জামাইবাবুর চেয়ে অনেক ছোট।

এইবার চার-পাঁচ বছরের দীর্ঘ ব্যবধান—যখন সুহাসিনী মাসিমার কথা কারো কাছে শুনিনি। তার পর একদিন আমার মাসিমা কাশী থেকে এলেন। বাল্যকালের সে দিনটি থেকে কতকাল চলে গিয়েছে—যে মাসিমা তখন ছিলেন তরুণী, তিনি এখন কাশীবাসিনী। আমারও বয়স উনচল্লিশ।

মাসিমা বললেন—দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ সুহাসিনী দিদির সঙ্গে দেখা হত কিনা। চমৎকার মেয়ে সুহাসিনী দিদি, ওর সঙ্গে মিশে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যেত। মস্ত বড় সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। কি সুন্দর গীতার ব্যাখ্যা করে। ওর মুখে গীতাপাঠ শুনতে শুনতে রাত যে কত হচ্ছে তা ভুলেই যেতুম। আহা, কি মেয়ে সুহাসিনী দিদি !

বহুকাল পরে সুহাসিনী মাসিমার আবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলাম।

সুহাসিনী মাসিমা চিরকাল লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে গেল—কপাল এক-একজনের। আমার ঠোঁটের আগায় এ প্রশ্ন কতবার এল—সুহাসিনী মাসিমা আজকাল দেখতে কেমন ?...বহুকাল তাঁর রূপের প্রশংসা কারো মুখে শুনিনি।

কিন্তু আমার মনের সেই বাল্যকালে গড়া মানসী রূপসী সমানই ছিলেন। বাল্যে তিনি ছিলেন শুধু রূপবতী, এখন রূপের সঙ্গে যোগ হল আধ্যাত্মিকতা। সুহাসিনী মাসিমা একেবারে দেবী হয়ে উঠলেন আমার মনে। আর এটাও মনে রাখতে হবে, দেবীদের মধ্যে সবাই তরুণী—বৃদ্ধা দেবী কেউ নেই।

পরের বছরই আমার চাকরির কাজে আমায় কাশী যেতে হল তিন-চার দিনের জন্যে। আমারবয়স চল্লিশ। মাসিমা যে বাড়িটাতে থাকতেন, সেখানে মামারবাড়ির গ্রামের আর একজন বৃদ্ধা থাকতেন। তাঁর নাম তারকের মা তিনি জাতে কৈবর্ত, তাঁর ছেলে তারকের নৈহাটিতে বড় দোকান আছে। আমার ওপর ভার পড়ল, তারকের মায়ের কাছ থেকে মাসিমার একটা হাত-বাক্স নিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া।

বেলা দশটা। মন্দিরাদি দর্শন করার পরে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে নামছি, সঙ্গে আছে তারকের মা।

তারকের মা স্নানার্থীদের ভিড়ের মধ্যে কাকে সম্বোধন করে বললে—দিদিঠাকরুনের আজ যে সকাল সকাল হয়ে গেল ?—যাকে উদ্দেশ করে বলা হল তিনি কি উত্তর দিলেন আমি ভালো করে শোনার আগেই তারকের মা আমার দিকে চেয়ে বললে—চিনতে পারলে না শচীন ?আমাদের গাঁয়ের কানাই-এর দিদি সুহাসিনী—চেনো না ?

বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠে দেখি একজন মুণ্ডিতমস্তক, স্থূলকায় বৃদ্ধা, এক ঘটি জল হাতে সিক্ত-বসনে উঠে চলে যাচ্ছেন। ফর্সা রং জ্বলে গেলে যেমন হয় গায়ের রং তেমনই, মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে—নিতান্ত নির্বোধ নিরীহ পাড়াগাঁয়ের বুড়িদের মতো মুখের চোখের ভাব।

সেই সুহাসিনী মাসিমা !

আমি কি আশা করেছিলুম এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরেও সুহাসিনী মাসিমাকে রূপসী যুবতী দেখতে পাব ?তবে কেন যে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলুম, কেন যে মন হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল—কে জানে !

বড় ক্লান্ত বোধ করলুম—ভীষণ ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ। ভাবলুম কাশীর কাজ তো মিটে গিয়েছে, মাসিমার বাক্সটা দিয়ে ওবেলার ট্রেনেই চলে যাব। থেকে মিছিমিছি সময় নষ্ট।